এক মহীরুহ

শায়খ ইউসুফ আল 'উয়াইরির রাহিমাহুল্লাহ জীবনি

শায়খ ইউসুফ আল-‘উয়াইরির জীবনী

লেখকঃ শহিদ শায়খ ইসা বিন সাদ আল-আসওয়ান (রাহিঃ)

আল্লাহ আপনার ওপর রহম করুন হে মহান শায়খ ইউসুফ আল-উয়াইরি। শাহাদাতের অমিয় সুধার পেয়ালার খোঁজে আফগানিস্তান ও সোমালিয়ার ময়দানে আপনি হন্যে হয়ে বেড়িয়েছেন। অবশেষে আরব উপদ্বীপে পরম আকাঙ্ক্ষিত সেই পেয়ালার সন্ধান পেলেন, পান করলেন ইচ্ছেমতো। ৩০/০৩/১৪২৪ হিজরি, শনিবার দিবাগত রাতে আমরা আপনার শাহাদাতের সংবাদ পেলাম। আমাদের অন্তরে মেঘ করে আসলো, দুচোখ অঝোরে অশ্রু বিসর্জন করল। সমগ্র আরব উপদ্বীপ জুড়ে যখন মুরতাদ্দিন, অ্যামেরিকার পদলেহী শাসকেরা ক্রুসেডারদের নীল নকশা বাস্তবায়ন করে চলছে, মুসলিমদের জান মাল, দ্বীন রক্ষার্থে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াইরত জানবাজ মুজাহিদিনদের হত্যা, গুম বা কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নিক্ষেপ করছে, তখন শায়খ ইউসুফের (রাহিঃ) মতো ব্যক্তিত্বকে হারানো সত্যিই বেদনার।

এই মুজাহিদ শায়খের জীবনী নিয়ে লিখতে বসে আজ কতো কিছুই না মনে পড়ছে। বিভিন্ন সময় তাঁকে বিভিন্নভাবে অনুরোধ করা হয়েছে, “শায়খ, আপনি ছদ্মনামে না লিখে স্বনামে লেখালেখি করুন। এতে মানুষদের মধ্যে মুজাহিদ শায়খ হিসেবে আপনার পরিচিতি বাড়বে, আপনার জ্ঞান দ্বারা তারা উপকৃত হবে এবং আপনাকে দেখে অনুপ্রাণিত হবে।” তিনি প্রতিবার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন আর বলেছেন, “আমার এসব পরিচিতির দরকার নেই, মুজাহিদিনদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এটা খুব ঝুঁকিপূর্ণ।”

প্রাথমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাগ্রহণ সমাপ্তির পর (তিনি মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাগ্রহণ করেছিলেন কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই) শায়খ যখন আফগানিস্তানের পবিত্র মাটিতে প্রথমবারের মতো পা রাখেন তখন তাঁর বয়স আঠারো-ও পেরোয়নি। জিহাদের প্রতি যে ভালোবাসা নিয়ে তিনি আফগানিস্তানে এসেছিলেন তা কখনও কমেনি, আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন তিনি এঁকেছিলেন—সেই প্রথম তারুণ্যেই—কখনও তা ফিকে হতে দেননি। রাহিমাহুল্লাহ।

তাঁর ছিল দ্রুত সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার অপার্থিব ক্ষমতা, প্রখর বুদ্ধিমত্তা আর ফটোগ্রাফিক মেমরি। এর সবকিছুই তাকে সোভিয়েত-বিরোধী আফগান জিহাদের প্রথম প্রহরে আল-ফারুক মিলিটারি ক্যাম্পের একজন যোগ্য প্রশিক্ষক হিসেবে গড়ে তুলেছিল। প্রশিক্ষক হিসেবে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। আল-ফারুক মিলিটারি ক্যাম্পে তিনি একবার একটা কোর্স ডিজাইন করেন। কোর্স শুরুর প্রথমে তিনি শিক্ষানবিশ ভাইদের উদ্দেশ্যে বলেন, “এই কোর্সটি এমন ভাবে ডিজাইন করা যে শুধুমাত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কঠিনপ্রাণ লোকেরাই এর শেষ পর্যন্ত যেতে পারবে। শুরুতেই ভারী অস্ত্রগুলোর ওপর প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, সবশেষে শেখানো হবে হালকা অস্ত্র চালানো।” ট্যাংক দিয়ে প্রশিক্ষণ শুরু হয়, শেষ হয় পিস্তল দিয়ে। চার মাস মেয়াদী কষ্টকর এই প্রশিক্ষণ শিক্ষানবিশদের সহ্যক্ষমতার শেষ বিন্দুরও পরীক্ষা নেয়। শায়খ ঠিক কথাই বলেছিলেন, হাতে গোনা কয়েকজন ইস্পাতকঠিন নওজোয়ান শুধু শেষপর্যন্ত টিকতে পেরেছিল।

বিভিন্ন যুদ্ধাস্ত্রের খুঁটিনাটি তথ্য ছিল তার ঠোঁটস্থ। মুজাহিদ ভাইদের মুখে মুখে ঘুরতো যুদ্ধাস্ত্রের ওপর তার গভীর জ্ঞানের কথা। ফ্রন্টে তিনি ছিলেন পর্বতের মতো অবিচল, লড়াইয়ের সংকটময় মুহূর্তে তাঁর সাহসিকতা ও ধৈর্যশীলতা ছিল কিংবদন্তিতুল্য।

সোভিয়েত-বিরোধী জিহাদের সমাপ্তি ঘটলে আফগানরা নিজেদের মধ্যে কামড়াকামড়ি শুরু করে দিল। শায়খ এই সময় শায়খ উসামা বিন লাদেনের (রাহিঃ) দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করতেন। এই সময় শায়খ উসামা আফগানিস্তান ত্যাগ করে সুদানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। একটি প্লেনে শায়খ উসামা (রাহিঃ) ও আল-কায়িদার প্রথম সারির নেতাদের সঙ্গে শায়খ ইউসুফও (রাহিঃ) সুদান পৌঁছালেন। তিনি সেখানে চার মাস অবস্থান করেছিলেন। পুরো সময়টাতেই শায়খ উসামার (রাহিঃ) নিরাপত্তার কাজে তিনি নিয়োজিত ছিলেন। সুদানে কাটানো দিনগুলোতে শায়খ উসামা (রাহিঃ) শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এর বিচক্ষণতা ও চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি করেন। সেই সময় মাঝে মাঝেই তিনি শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। সুদানে শায়খ উসামার (রাহিঃ) যাপিত জীবনের নানা ঘটনা, উদারহস্তে তাঁর দানসাদকা করার কথাসহ আরও অনেককিছুই তিনি আমাকে শুনিয়েছেন। এই গল্পগুলো শোনানোর সময় তাঁর চোখে এক স্বপ্নালু আবেশ নেমে আসতো, সেই চোখের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নালু আবেশের ভেতর আমি দেখতে পেতাম এক সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা—শায়খ উসামার (রাহিঃ) সান্নিধ্যে কাটানো পুরোনো সেই সোনালি দিনগুলো ফিরে পাবার এই আকাঙ্ক্ষা।

মিলিটারি জিনিয়াস শায়খ আবু হাফস আল-মিসরির (রাহিঃ) সাথে শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) প্রায়ই সামরিক কৌশল নিয়ে আলোচনা করতেন। সোমালিয়ার মাটিতে আক্রমণের পরিকল্পনা (ব্ল্যাকহক ডাউন/ব্যাটল অফ মোগাদিসু) কিংবা শায়খ উসামার (রাহিঃ) মাস্টার প্ল্যান অনুসরণ করে ফারনাক-এ হামলা চালানো—তাঁদের আলোচনা থেকে কোনো কিছুই বাদ পড়তো না। সোমালিয়ার মাটিতে নব্য ক্রুসেডার আমেরিকার বিরুদ্ধে জিহাদে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমেরিকান বাহিনীর চোখের জল নাকের জল এক করে সোমালিয়ার মাটি থেকে 'খেদানোর' বিরল সম্মান অর্জন করেন। এই সময় অধিকাংশ মুসলিম তরুণ উম্মাহর প্রতি উদাসীন ছিল, উম্মাহর প্রতি তাদের দায়িত্ব কর্তব্য ভুলে কোনো এক অজানায় হারিয়ে গিয়েছিল তারা।

শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এরপর আরব উপদ্বীপে ফিরে আসেন এবং সেখানকার প্রখ্যাত সব আলিমদের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই সময়ই তিনি শায়খ সালমান আল-আওদাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং শাইয়খের কাছ থেকে উম্মাহ কী প্রত্যাশা করে, তা স্মরণ করিয়ে দেন। তখন শায়খ সালমান শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) বলেছিলেন, "শায়খ উসামার সৈনিক হবার সুযোগ পেলে আমি নিজেকে সম্মানিত মনে করব।" আল্লাহর কসম, আমি শায়খ ইউসুফের (রাহিঃ) মুখে দেড় বছরের ব্যবধানে এই কথা দুবার শুনেছি। খোবার বিস্ফোরণের পর শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) গ্রেফতার করা হয় এবং দাম্মামের ন্যাশনাল ইন্সপেকশন কারাগারে তাঁর ওপর ব্যাপক নির্যাতন চালানো হয়। বিস্ফোরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের অন্যতম একজন হিসেবে তাকে অভিযুক্ত করা হয়। শায়খ ইউসুফের (রাহিঃ) ওপর চালানো নির্মম অত্যাচারের কাহিনি সেই কারাগারে বন্দি ভাইদের মুখেই শুনুন —শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) চাবুকপেটা করা হত, তাঁর দাড়ি উপড়ে ফেলা হত। অত্যাচারের মাত্রা এত তীব্র ছিল যে, প্রত্যেকবারই তাঁকে স্ট্রেচারে শুইয়ে টর্চার সেল থেকে নিয়ে আসা হত। অত্যাচারের স্টিম রোলার শায়খের ওপর চলতেই থাকে। শেষমেষ তিনি আল-সালুল ইন্সপেকশন টিমের মানুষরূপী জানোয়ারদের সামনে স্বীকারোক্তি দেন যে, তিনি খোবার বিস্ফোরণে জড়িত ছিলেন।

শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) সেই সময়ের ঘটনাগুলো আমাকে বলেন এভাবে, "টর্চার সেলে দীর্ঘদিন শারীরিক এবং মানসিক ভাবে অত্যাচারিত হওয়ার পর এক অফিসারকে বললাম—খুব গুরুত্বপূর্ণ এক বিষয়ে আমি জবানবন্দী দিতে চাই।" অফিসার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করল। আমাকে সেল থেকে ডেকে একটি বিলাসবহুল কক্ষে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে খুব দামি ও আরামদায়ক এক সোফায় আমাকে বসতে দেয়া হলো। কারাপ্রধানকে বেশ কয়েকজন অফিসার ঘিরে রেখেছিল, সবাই নোটবুক ও কলম হাতে প্রস্তুত; আমার স্বীকারোক্তির একটা দাঁড়ি কমাও মিস করতে তারা রাজি নয়। কারাপ্রধান আমার দিকে তাকাল। আমার দুপায়ে বেড়ি পরানো। সে বলল, "আর দেরি নয়, আপনার স্বীকারোক্তি জলদি শুরু করুন।" শায়খ বললেন, "খোবার বিস্ফোরণে জড়িত ব্যক্তিদের সম্পর্কে তথ্যের অপ্রতুলতা আপনাদের যে মানসিক যন্ত্রনার মধ্যে ফেলেছে তা আমি উপলব্ধি করতে পারি। আমি বুঝি আপনাদের কষ্ট। আমি ওই বিস্ফোরণের সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি।" আমি অবাক হয়ে শায়খকে (রাহিঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "কেন আপনি এমনটা করলেন?" শায়খ উত্তর দিয়েছিলেন, "আমাদের পক্ষে কোনোমতেই সেই ভয়াবহ নির্যাতন আর সহ্য করা সম্ভব হচ্ছিল না। কারাগারের অত্যাচার, নির্যাতন সহ্য করার চেয়ে আমাদের জন্য মৃত্যুবরণই সহজ ছিল।"

শায়খ (রাহিঃ) বলে চললেন, "আমি স্বীকারোক্তি শেষও করতে পারিনি এমন সময় কারাগার প্রধান আমার মুখে তার কাঁচের সিগারেটের কেসটি ছুড়ে মারলো, ক্রুদ্ধস্বরে সে তার অফিসারদের হুকুম দিল—এই ঘর থেকে একে বের করে নিয়ে যাও, আর আগের মতোই শাস্তি দিতে থাক।

শায়খের (রাহিঃ) ওপর অত্যাচার, নির্যাতন আগের মতোই চলতে থাকলো। এই সময় শায়খের (রাহিঃ) ওপর ঠিক কী ধরনের নির্যাতন করা হয়েছিল সে ব্যাপারে শায়খ (রাহিঃ) কখনোই মুখ খোলেননি। একদিন খুব গোপনে শায়খকে (রাহিঃ) এক অফিসারের কাছে নিয়ে যাওয়া হলো । শায়খকে (রাহিঃ) সেই অফিসার বলল—আপনার জন্য একটি সুখবর আছে, বিস্ফোরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আমরা সনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি, ওই বিস্ফোরণের জন্য আপনারা দায়ী নন, দায়ী রাফেযিরা (ইমামি শিয়া); আশা করি এই ব্যাপারটা কেবল আমার আর আপনার মধ্যেই থাকবে। শায়খকে (রাহিঃ) গোপনে আবার সেলে ফেরত পাঠানো হলো। এই ঘটনার পর থেকে শায়খের (রাহিঃ) ওপর অত্যাচার বন্ধ হলো। কারাপ্রধান তার সব অফিসারকে ডেকে বললো—খোবার বিস্ফোরণের সাথে জড়িত সন্দেহে যেসব ব্যক্তিদের গ্রেফতার করে শাস্তি দেয়া হয়েছে, তারা আসলে বিস্ফোরণের সঙ্গে জড়িত নয়, তাদের প্রত্যেকের নামে মিথ্যা মামলা সাজাও এবং এই সাজানো মামলায় তাদের বিচার করা হবে। কারাবন্দি সেইসব নিরাপরাধ ভাইদের প্রত্যেকের নামে তাকফির করাসহ বিভিন্ন অভিযোগ এনে মামলা সাজানো হলো। সালুলি আইন অনুসরণ করে এই মিথ্যা মামলার বিচারও করা হলো। এরপর শায়খকে (রাহিঃ) দীর্ঘদিন কারাবন্দি হিসেবে কাটাতে হয়। মাঝে তিনি কারাগারে প্রতিবেশী হিসেবে পেয়েছিলেন রাফেযি শিয়াদের; এদের মধ্যে বেশ কয়েকজন 'আয়াহ' (সর্বচ্ছ পর্যায়ের রাফেযি 'আলিমদের' উপাধি) ও সাইয়িদ (যারা নিজেদেরকে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) এর বংশধর দাবি করে) ছিল । শায়খ (রাহিঃ) মাঝে মধ্যেই তাদের সঙ্গে বিতর্কে বসতেন। শায়খের (রাহিঃ) দলিলিক আলোচনা এবং ক্ষুরধার যুক্তির কাছে তারা হার মানতো। শেষমেষ রাফেযি আলিমরা শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) সম্পর্কে তাদের অনুসারীদের সতর্ক করল—সাবধান, তোমরা এই লোকের কোনো কথা শোনা তো দূরে থাক, তার কাছেও বসবে না।

শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) বলেন, "আমি ঘুমের ভান করে শুয়ে থাকতাম। তখন রাফেযি আলেমরা তাদের অনুসারীদের ওয়াজ নসিহত করত। আমি চুপচাপ মরার মতো পড়ে থেকে সব শুনতাম। যখন তাদের ভ্রান্ত যুক্তি এবং দলিলের বড়সড় ফাঁকফোকর পেতাম, তখন ঘুমের ভান থেকে উঠে তাদের যুক্তির অসারতা দেখিয়ে দিতাম।" আমার সঙ্গে দলিলিক আলোচনায় না পেরে তারা খুব বিরক্ত হত, রেগেও যেত। কিছুদিন পর শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) সাধারণ এক কারাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এই কারাগারের বন্দিরা আহলে সুন্নাহ ওয়াল জামাহর আকিদাহর অনুসারী ছিলেন। এরপর একসময় সলিটারি সেলের (একাকী কারা সেল। এ ধরনের সেলের বন্দিদের দিনভর কারও সাথে দেখা ও কথা বলতে দেয়া হয় না) দাবিতে শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। তিনি ভেবেছিলেন সলিটারি সেলের নির্জনতা তাকে তার রবের ইবাদাতের আরও বেশি সুযোগ করে দেবে এবং সময়ের সদ্ব্যবহার করাও তার পক্ষে সহজ হবে। কারা কর্তৃপক্ষ তাঁর দাবি মেনে নিয়ে তাঁকে একটি সলিটারি সেলে স্থানান্তর করে। কারাগার থেকে মুক্তি পাবার আগে এই সেলে তিনি দেড় বছরেও বেশি সময় কাটান।

আমি একবার শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "এই নির্জন কারাবাস কি আপনাকে বিষন্ন করে তোলেনি, মাঝে মাঝে আপনার যাপিত জীবন আপনার কাছে একঘেয়ে মনে হয়নি?" শায়খ ইউসুফ (রাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, "আল্লাহর কসম, সময়ের সঙ্গে আমাকে পাল্লা দিয়ে চলতে হত। ঘুমানোর জন্য আমি খুব কম সময়ই পেতাম । আর ফরজ গোসলের অবস্থা সৃষ্টি না হলে গোসলের সময় বের করাও আমার জন্য কষ্টকর ছিল।"

কুরআন এবং পূর্বযুগের আলেমদের বই নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন করতে সলিটারি সেলের একাকীত্ব, নির্জনতা তাকে সুযোগ করে দিয়েছিল । তিনি এই সেলে বসেই পুরো কুরআন মুখস্থ করে ফেলেন, সেই সাথে সহিহ বুখারি ও মুসলিমও। একবার এক কারারক্ষী তাকে বলল—আল্লাহর কসম, আপনার জন্য আমার করুণা হয়, কী বেহাল অবস্থাতেই না আপনি দিন কাটাচ্ছেন। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) উত্তর দিলেন, "আল্লাহর কসম! তোমার দুরাবস্থার জন্য আমারই বরং তোমাকে করুণা করতে ইচ্ছে করে। ইশ! আমাকে কেউ যদি বলত, আগামীকাল থেকে আটাশ ঘণ্টায় দিন হবে, তাহলে কতোই না ভালো হত! চব্বিশ ঘন্টার দিন আমার আর পোষাচ্ছে

না।” শায়খের (রাহিঃ) উত্তর শুনে কারারক্ষী লা-জওয়াব হয়ে গেল। সেই বেচারার আর কীই বা দোষ! সে দেখছে সেলের ভেতরে এই মানুষটা রাতদিন এক করে পড়াশোনা করছেন, খুব জরুরি দরকার না হলে সেল থেকে বেরই হচ্ছেন না।

শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) আমাকে মাঝে মাঝেই বলতেন, “কারাগারে আমি ইমানের যে স্বাদ পেয়েছি, আমার ইমান যে কতটুকু বৃদ্ধি পেয়েছিল, তা কেবল আমার রবই জানেন। একদিন যখন কারারক্ষী এসে আমাকে বলে, “সুসংবাদ,আপনাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।” আমার মধ্যে তখন আনন্দ বা স্বস্তির কোনো অনুভূতিই কাজ করছিল না। আমি শুষ্ক কণ্ঠে কারারক্ষীকে বললাম, “তুমি কোনো সুখবর নিয়ে আসনি।” আসলে আমার ইমানি এই জযবার পেছনে ছিল কারাগারে আমি যে ইলম অর্জন করেছিলাম, সেই ইলমের বারাকাহ এবং আমার প্রতি আল্লাহর (সুবঃ) রহমত"। কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) পুনরায় জিহাদে ফিরে গেলেন। মুজাহিদিনের সঙ্গে বিশেষ করে শায়খ উসামার (রাহিঃ) সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করলেন।

দাগেস্তান ও চেচনিয়ার যুদ্ধের সময় তিনি the voice of Qūqāz এ শরিয়াহর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে—ফিদায়ি হামলাঃ আত্মহত্যা নাকি শাহাদাত? রাজনীতি নিয়েও তিনি লিখেছেন। সেই লেখার শিরোনাম ছিল—“মস্কো থিয়েটার হামলাঃ মুজাহিদদের প্রাপ্তি”

শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) চেচনিয়ার কিংবদন্তিতুল্য কমান্ডার খাত্তাবের (রাহিঃ) সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁর দুর্লভ সামরিক অভিজ্ঞতা, যুদ্ধ পরিচালনা এবং যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণের অসামান্য পারদর্শিতার দ্বারা চেচনিয়ার মুজাহিদিনরা বহুবার উপকৃত হয়েছেন। চেচনিয়ার জিহাদ যখন গতানুগতিক সম্মুখ যুদ্ধ থেকে গেরিলা যুদ্ধে রূপ নিল, তখন শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) খাত্তাবকে (রাহিঃ) একটি চিঠি পাঠান। এই চিঠিতে যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) আঠারোটি সম্ভাব্য পরিণতির কথা আলোচনা করেন। এর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে মুজাহিদিনদের করণীয় সম্পর্কে দিকনির্দেশনা দেন। মুজাহিদিনরা শায়খের (রাহিঃ) এই চিঠি থেকে খুবই উপকৃত হন। শায়খের এই মূল্যবান নাসিহার জন্য কমান্ডার খাত্তাব (রাহিঃ) শায়খের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। চেচনিয়ার মুজাহিদিনের জন্য তহবিল সংগ্রহের কাজেও শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তহবিল সংগ্রহের সময় শায়খের সঙ্গে কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। তহবিল সংগ্রহের কাজে জড়িত কিছু আলেম শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করেন।

শায়খ সালমান আল-আওদাহর সঙ্গে এই সময়কার একটি ঘটনা শায়খ ইউসুফ আমাকে বলেছিলেন। দাগেস্তানে অবস্থান করার সময় একবার কমান্ডার খাত্তাব (রাহিঃ) বলেছিলেন—এক মিলিয়ন ডলার পেলে এই শীতকালের মধ্যেই আমরা রাশিয়াকে পরাজিত করে ফেলব ইনশা আল্লাহ। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এক সম্পদশালী ব্যক্তিকে এই কথা জানালে ঐ ব্যক্তি আট মিলিয়ন সৌদি রিয়াল অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হন। কিন্তু তিনি শর্ত দিলেন, এ ব্যাপারে শায়খ সালমান আল-আওদাহর লিখিত অনুমতি লাগবে অথবা শায়খ সালমান আল-আওদাহর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধায়নে অর্থের আদানপ্রদান সম্পন্ন করতে হবে। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) শায়খ সালমানের কাছে গেলেন, কিন্তু শায়খ সালমান আল-আওদাহকে চেচনিয়াতে এই আট মিলিয়ন সৌদি রিয়াল পাঠানোর ব্যাপারে কোনোমতেই রাজী করাতে পারলেননা।

এত প্রতিকূলতা, বাঁধা-বিপত্তিও শায়খ ইউসুফকে (রাহিঃ) আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার সংগ্রাম থেকে কখনোই পিছু হটাতে বা নিরুৎসাহিত করতে পারেনি। আফগানিস্তানে তালিবানদের উত্থান শুরু হলে চেচনিয়ার মুজাহিদিনদের সঙ্গে শায়খের (রাহিঃ) যোগাযোগ কিছুটা স্তিমিত হয়ে আসে। তিনি তালিবানদের উত্থান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলেন। ২০০১ সালের মার্চ মাসের এক পবিত্র দিনে তালিবানরা আফগানিস্তানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করে। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) সেই সময় তালিবানদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের কাজে অংশগ্রহণকরেন। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) আমিরুল মুমিনিন মোল্লা ওমর (রাহিঃ) এবং তালিবান মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। শায়খের (রাহিঃ)উদ্দেশ্য ছিল, তালিবানদের সঙ্গে শায়খ হামুদ আল-উক্বলার (রাহিঃ) যোগাযোগ করিয়ে দেয়া। ১৪২১ হিজরিতে হাজ্জ চলাকালীন সময়ে শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) মক্কাতে তালিবান মন্ত্রিপরিষদের কয়েকজন মন্ত্রীর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করেন। তাঁর প্রচেষ্টাতে আইয়ামে তাশরিফের[1] কোনো এক রাতে শায়খ হামুদ আল-উক্বলার (রাহিঃ) সঙ্গে টেলিফোনে আমিরুল মুমিনিন মোল্লা ওমর (রাহিঃ) এর কথোপকথন হয়। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) সেই সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমাকে বলেছিলেন, "আমরা সেদিন মক্কার বাইরে ছিলাম আর আমাদের হাতে একদমই সময় ছিল না। শায়খ হামুদ (রাহিঃ) ছিলেন ক্বাসিমে। সে কারণে ক্বাসিমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ছাড়া আমাদের হাতে আর কোনো উপায় ছিল না। আমরা ক্লান্তির চরমসীমায় পৌঁছে গিয়েছিলাম। আমরা ঠিক করলাম, কিছু সময় আমি গাড়ি চালাবো এবং আমার সঙ্গী ঘুমিয়ে নেবে, তারপর আমার সঙ্গী গাড়ী চালাবে আর আমি সেই ফাঁকে ঘুমিয়ে নেব। সারারাত আমরা পালাক্রমে গাড়ি চালিয়ে যেতে থাকলাম। একসময় ক্লান্তির কাছে আমাকে নতিস্বীকার করতেই হলো, ঘুমিয়ে পড়লাম। তীব্র ঝাঁকুনি আর রাস্তার সঙ্গে গাড়ির চাকার ঘর্ষণের তীক্ষ্ণ শব্দ আমার ঘুম ভাঙালো। রাস্তায় উইন্ডস্ক্রিনের ঠিক সামনে ধূসর রঙের একটা উট দেখে আমার সঙ্গী গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন।"

জেল থেকে বের হবার পর শায়খ (রাহিঃ) নব উদ্যমে জিহাদ নিয়ে লেখালেখি শুরু করেন এবং মুরতাদদিন ও মুনাফিকরা জিহাদের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার চালাচ্ছিল, জিহাদের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি করেছিল, সেগুলো দূর করার চেষ্টা চালাতে থাকেন। এই সময় আজ্জাম নামে প্যালটকরুমে বেশ কয়েকটি ভিডিও চ্যাটে তিনি অংশগ্রহণ করেন। আফগান জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি তরুণদের উৎসাহিত করতে থাকেন। তরুণদের সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যাপারে জোর দেন। তিনি চারটি অডিও ক্লিপ তৈরি করেন, এগুলোতে জিহাদের ডাকে সবাইকে সাড়া দেয়ার আহ্বান জানান এবং সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার ব্যাপারে অনুপ্রাণিত করেন। পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক আহমদ শাহ মাসউদকে হত্যা করা হলে শায়খের (রাহিঃ) খুশির বাঁধ ভেঙ্গে যায়। আমার মনে আছে, আমি সেই সময় শায়খের (রাহিঃ) কাছেপিঠেই ছিলাম। শায়খকে (রাহিঃ) এতো আনন্দিত দেখে আমি তঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "শায়খ, কোনো খুশির খবর আছে বলে মনে হচ্ছে?" শায়খ (রাহিঃ) আমাকে বললেন, "ঠিক ধরেছ, শায়খ উসামা (রাহিঃ) মুজাহিদ ভাইদেরকে বলেছিলেন— তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে আহমদ শাহ মাসউদকে জাহান্নামের টিকিট কিনে দিবে, এই পাপিষ্ঠ আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) সাথে বেইমানি করেছে। কয়েকজন ভাই এই পবিত্র কাজের সওয়াবের কথা মাথায় রেখে আগ্রহভরে ওঠে দাঁড়িয়েছিলেন। আলহামদুলিল্লাহ! সেই নরাধামকে জাহান্নামে পাঠানো হয়েছে।"

এরপর আসলো ৯/১১ এর সেই ইতিহাসের মোড় ঘোরানো বরকতময় হামলা। অহংকারী, ঔদ্ধত, আল্লাহর দ্বীনের শত্রু আমেরিকার সব দর্প-অহংকার ধুলোতে মিশিয়ে দেয়া হলো। শায়খ ইউসুফের (রাহিঃ) আনন্দ আর ধরে না। তিনি আমাকে বললেন, "আলকাসিমে আলিমদের এক সভায় আমি উপস্থিত ছিলাম। সেখানে ৯/১১ এর হামলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। হাতে গোনা কয়েকজন আলিম ছাড়া সবাই এই বরকতময় হামলার (সমর্থনের) ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন।" শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) আমাকে সেই সভার খুঁটিনাটি সব আলোচনা শুনিয়েছিলেন। মুজাহিদিনদের প্রতি আলিমদের এই ইতিবাচক মনোভাব ও সহানুভূতিশীলতা এই ফরজ কাজকে গতিশীল করে তুলেছিল। ৯/১১ এর বরকতময় হামলার পরপরই শায়খ (রাহিঃ) তাঁর জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বইটি লেখা শুরু করেন। মাত্র ৯-১০ দিনের মধ্যেই তিনি লিখে ফেলেন দুনিয়া তোলপাড় করে ফেলা বই 'বর্তমান ক্রুসেড যুদ্ধের বাস্তবতা'। বইটি ছিল একটি মাস্টারপিস। বইয়ে তিনি ফিদায়ি হামলার ব্যাপারে জোরালো শরয়ি দলিল তোলে ধরেন এবং যেই যুক্তিগুলোর ওপর ভিত্তি করে ফিদায়ি হামলার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানো হয়, মুন্সিয়ানার সঙ্গে সেই যুক্তিগুলোর অসারতা দেখিয়ে দেন। সেই সঙ্গে এই বইয়ে তিনি উদাসীন মুসলিম উম্মাহকে আহ্বান জানান, তারা যেন উদাসীনতা ঝেড়ে ফেলে অবহেলিত এই ফরজ কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তালিবান আন্দোলনের যৌক্তিকতা নিয়েও তিনি এই বইয়ে আলোচনা করেন। শায়খ উসামার (রাহিঃ) কাছে এই বইটি পৌঁছালে তিনি প্রচন্ড বিস্মিত হয়ে মন্তব্য করেন, "দেখে তো মনে হচ্ছে ৯/১১ এর হামলার আগেই এটি লেখা হয়েছে। এতো চমৎকার একটি বই কীভাবে এতো অল্পসময়ের মধ্যে লেখা সম্ভব!"

আল্লাহর কসম! শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এই বইটি ৯/১১ এর হামলার পরেই লিখেছিলেন। তিনি রাতদিন পরিশ্রম করে মাত্র কয়েকদিনেই এমন একটি বই লিখে ফেলেছিলেন, যার যুক্তিগুলো ছিল ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে অভেদ্য। কুরআন ও সুন্নাহ থেকে

---

[1] ১০ জিলহাজ্জের পরের তিনদিন

দলিল নিয়ে সম্পূর্ণ একাডেমিক মেজাজে লেখা এই বইটি আলিমদের কাছে বেশ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে এবং আলিমরা দলে দলে ৯/১১ এর বরকতময় হামলাকে সমর্থন জানান।

শায়খের (রাহিঃ) লেখনী যেন ছিল চৈত্রের এক পশলা বৃষ্টির মতো, যা ক্রুসেডার মিডিয়ার প্রোপাগান্ডা, ক্রুসেডারদের বেতনভোগী দ্বীন বিকৃতকারী দরবারি আলিম, মুনাফিক আর মুরতাদদিনের কুযুক্তি, বিভ্রান্তির নিচে চাপা পড়ে ধুকে ধুকে চলা মৃতপ্রায় মিল্লাতে ইব্রাহিমকে দিয়েছিল পুনর্জীবনের সঞ্জীবন শক্তি। শত্রুর মোকাবেলায় মুসলিম নারীদের ভূমিকা কী হতে পারে, তা নিয়ে তিনি লিখেন 'আবদ আল্লাহ আয যাইদ' শিরোনামের একটি বই। 'জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর অপরিবর্তনশীল বিষয়সমূহ' শিরোনামে তিনি আরেকটি অসাধারণ বই লেখেন। এছাড়া ইন্টারনেটে বিভিন্ন ফোরাম, ব্লগে তিনি নিয়মিতই লেখালেখি করতেন।

শায়খকে যে ব্যাপারটি সবচেয়ে বেশি কষ্ট দিত, তা হলো আলিমদের জিহাদ পরিত্যাগ করা। আমার মনে আছে, আলিমদের জিহাদ পরিত্যাগ করা এবং এই ফরজ কাজ সম্পর্কে উদাসীনতার কথা আলোচনা করতে গিয়ে একবার তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। এই অবহেলিত ফরজ কাজকে আঁকড়ে ধরা ময়দানের মুজাহিদ ভাইদের বিরুদ্ধে ক্রুসেডার মিডিয়া এবং দরবারি আলিমদের মিথ্যাচার ও প্রপাগান্ডার বিরুদ্ধে এ কারণেই অনেক কলম চালিয়েছেন তিনি। আদ-দিরাসার নামক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত 'ইরাকের বিরুদ্ধে ক্রুসেড' শিরোনামের জনপ্রিয় একটি সিরিজের অধিকাংশ পর্বই (প্রায় ৮০ শতাংশ) তিনি নিজে লিখেছেন।

তাঁর ছিল অসামান্য বাগ্মিতা ও গভীর অধ্যাবসায়। এর সবকিছুই রাজনৈতিক বিশ্লেষণ এবং শরিয়াহভিত্তিক লেখালেখিতে তাঁকে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী করে তুলেছিল; রাহিমাহুল্লাহ। এই অসাধারণ গুণাবলির কারণে শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) আলিমদের মধ্যে সুপরিচিত ছিলেন। কোনো কিছুই তাকে জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটাতে পারেনি। কতবার তাঁর হৃদয় ভেঙে গেছে, কত ভালোবাসার মানুষকে তিনি হারিয়েছেন, তাগুতের হাতে তাঁর কত বন্ধু শহিদ হয়েছেন, কতজন মারাত্বকভাবে আহত হয়েছেন অথবা বন্দি হয়েছেন, তবুও শায়খ ভেঙে পড়েননি। আল্লাহর কদর হাসিমুখে মেনে নিয়েছেন। রাহিমাহুল্লাহ।

শায়খের (রাহিঃ) অন্তর ছিল খুবই নরম, অল্পতেই তাঁর দুচোখ অঝোরে অশ্রু বর্ষণ করতো, বিশেষ করে তাঁর সামনে মুজাহিদিন এবং আল্লাহর রাস্তায় তাঁদের কুরবানির কথা আলোচনা করলে তিনি অঝোরে কাঁদতেন। সেই দিনের কথা আমি কখনোই ভুলতে পারবনা, শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) আবু হাজির আল-ইরাকির (গুয়ান্তানেমো বে কারাগারে বন্দি) আল্লাহর রাস্তায় কুরবানির কথা আলোচনা করেন। তারপর তিনি কান্নায় ভেঙে পড়েন। আর তাঁকে কেউ আল্লাহর কথা,আখিরাত, জিহাদ আর শহীদের কথা স্মরণ করিয়ে দিলেই কাঁদতে শুরু করতেন। রাহিমাহুল্লাহ।

ইসলামি শরিয়াহর আলোকে জিহাদের গুরুত্ব, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে উম্মাহকে অবহিত করার ওপর তিনি প্রচন্ড গুরুত্বারোপ করতেন। তিনি বলতেন, "এটা আমাদেরই দায়িত্ব যে, আমরা উম্মাহকে বোঝাব, কালিমা তাইয়িবা 'লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ (সাঃ)' এর দাবি হলো জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। তাওহিদের প্রকৃত রূপ উম্মাহর সামনে তুলে ধরাও আমাদের একান্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য। তাগুতকে বর্জন করে তাগুতের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাওয়া এবং জিহাদের ময়দানে অটল,অবিচল থাকার জন্য উম্মাহকে তাওহিদ বোঝানোর কোনো বিকল্প নেই।" তিনি (রাহিঃ) প্রায়ই এ প্রসঙ্গে আমাকে আরেক মহান শায়খ আব্দুল্লাহ আলআযযামের (রাহিঃ) একটা কথা বলতেন—যে আশা ও উদ্দেশ্য নিয়ে তুমি জিহাদে এসেছ, তা বদলে যাবে। অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছেন যে, অনেকেই মুসলিমদের উপর চলমান নির্যাতন অথবা মুসলিম নারীদের করুণ অবস্থা দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করে। উম্মাহর প্রতি এই সহানুভূতি অবশ্যই প্রশংসনীয় কিন্তু এরচেয়েও উত্তম হলো, একজন মুজাহিদ তাওহিদের শিক্ষা ও জযবাতে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং জিহাদে অংশগ্রহণের দায়িত্ববোধ থেকে জিহাদের ভূমিতে আগমন করবে। এর ফলে তাওহিদের নির্যাস মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে এবং পরবর্তীতে তাওহিদের উপর ভিত্তি করে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

এই দুনিয়ার আরাম, আয়েশ বিলাশিতার সবরকমের সুযোগই ছিল শায়খ ইউসুফের (রাহিঃ। কিন্তু তিনি ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার জিল্লতিতে ভরা এই জীবনের চেয়ে বেছে নিয়েছিলেন জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর সম্মানিত জীবন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন ধনী ব্যবসায়ী। জিহাদের কাঁটাভরা, বন্ধুর পথের পথচলায় সবসময়ই শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) তাঁর পিতার আকুন্ঠ সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছেন। আর তাঁর মায়ের কথা বলাই বাহুল্য। শায়খের মা শায়খকে শুধু জিহাদের ময়দানে নির্ভীক, অবিচল থাকার জন্য উৎসাহ দিতেন না বরং সবসময় উপদেশ দিতেন, যেন শায়খ কোনো অবস্থাতেই জিহাদ পরিত্যাগ না করেন। সুবহানআল্লাহ! কী অসাধারণ একজন মা, যিনি এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করেছিলেন, যিনি মৃত্যুকে পরোয়া করেন না।

শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) ছিলেন অসম্ভব বিনয়ী। বিনয়ের বশে মজলিসের সঙ্গীদের সঙ্গে তিনি এমনভাবে কথা বলতেন যে, তার সঙ্গীরা মনে করতো, শায়খ বোধহয় আমাকে তারচেয়ে বেশি জ্ঞানী ভাবছেন। তিনি মজলিসে নিজে কথা বলার চাইতে অন্যান্যদের কথা শুনতেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। আলিম ও তালিবুল ইলমদের সামনে তাদের সম্মানার্থে নিজের মতামত প্রকাশ থেকে বিরত থাকতেন। তিনি ছিলেন বিনয়ের মূর্ত প্রতীক। তার বিনয় ছিল পুরোটাই খাঁটি, কোনো ভান ছিল না। বিনয় ছিল তাঁর বিশুদ্ধ ফিতরাহ—অবিচ্ছেদ্য অংশ—আল্লাহর (সুবঃ) এক বিশেষ নিয়ামত।

শায়খ ইউসুফ যেন ছিলেন এক জীবন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া। অনেক বিষয়ের ওপরই তাঁর পান্ডিত্য ছিল। শরিয়াহ নিয়ে তাঁকে কথা বলতে শুনলে আপনার মনে হবে তিনি বোধহয় একজন গভীর প্রজ্ঞাধারী আলিম, রাজনীতি নিয়ে তার বিশ্লেষণ শুনলে আপনি তাঁকে ভাববেন, একজন ঝানু রাজনীতিবিদ। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এ তিনি ছিলেন বেশ দক্ষ, সামরিক বিজ্ঞানে তাঁর ছিল অগাধ জ্ঞান। ইলেক্ট্রনিক্স, আধুনিক টেকনোলোজির বিভিন্ন শাখা এবং ভূসংস্থান বিদ্যাতেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল।

আল্লাহ (সুবঃ) মানুষদের অন্তরে শায়খ ইউসুফের (রাহিঃ) প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি করেছিলেন। যে ব্যক্তিই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করত, সে-ই শায়খের আচার ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেত। আমার এমন কারও কথা জানা নেই, যে কখনও শায়খের আদব কায়দা, আচার-আচরণের সমালোচনা করেছে। সুন্দর ব্যবহার, নিষ্কলুষ চরিত্রের জন্য সবার কাছেই তিনি ছিলেন খুব প্রিয়। আর আমরা তাঁর সম্পর্কে এমন ধারণাই পোষণ করি। এই পার্থিব জীবনের আরাম আয়েশ বিলাসিতা ত্যাগ করে পরিশ্রমী জীবন যাপন করার জন্য তিনি যুবক ও মুজাহিদিনদের উৎসাহিত করতেন। এই পরিশ্রমী জীবনযাপন যুবক ও মুজাহিদিনদের কষ্টসহিষ্ণু হিসেবে গড়ে তুলবে এবং জিহাদের ময়দানে যে কোনো পরিস্থিতিতেই খাপ খাইয়ে নিতে সাহায্য করবে। পর্যাপ্ত পরিমাণ খাবার থাকার পরও তিনি খুব অল্প খাবার খেয়ে দিনাতিপাত করতেন, যেন জিহাদের ময়দানে খাদ্যসংকটে পড়লেও মানিয়ে নিতে পারেন। দান-সদকার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন উদার, মুক্তহস্ত। তাঁর আমানতদারিতা ছিল অন্য মাত্রার। নিজের কাছে আমানত রাখা মুজাহিদিনদের ধনসম্পদ তিনি যেকোনো মূল্যে রক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন।

আমেরিকান প্রভুদের হুকুমে সৌদি রাজপরিবার শায়খ ইউসুফের (রাহিঃ) ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিল, যেন তিনি অন্তত এক বছরের জন্য হলেও নিষ্ক্রিয় থাকেন। কিন্তু তিনি উম্মাহর বিশ্বাসঘাতক সৌদি রাজপরিবারের চাপের কাছে মাথা নত করেননি। আল্লাহ রহমতে ঠিক ওই বছরেই তিনি উম্মাহর যে খেদমত করেছিলেন, তা তাঁর পক্ষে পাঁচ বছরেও করা সম্ভব ছিল না।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি নিরলসভাবে উম্মাহর খেদমতের জন্য কাজ করে গিয়েছেন। এমনকি বেশ কয়েকবার তিন-চার দিন পার হয়ে গিয়েছে কিন্তু তিনি ঘুমানো বা সামান্য বিশ্রাম নেয়ার সময়টুকুও পাননি। আর যখন তিনি ঘুমুতেন, তখন খুব অল্প সময়ের জন্যেই ঘুমুতেন—দুপায়ে উঠে দাঁড়ানোর শক্তি জোগাড় করার জন্য যতটুকু সময় ঘুমানোর দরকার। আল্লাহর কসম! আমি কিছুই বাড়িয়ে বলছি না, বরং কিছুটা কমিয়েই বলছি। এই সবকিছুই আমি নিজের চোখে দেখেছি অথবা বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের কাছ থেকে শুনেছি। রাহিমাহুল্লাহ।

সেই বছর তাঁকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ফেরারি হয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে। শত্রুর গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে হয়েছে, সশস্ত্র অবস্থায় সার্বক্ষণিক সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। সেই সময় তিনি আমাকে বলতেন—হে আমার ভাই, তুমি মনে করোনা

যে আমরা মদিনার সাহাবিদের (রাঃ) চেয়েও বেশি ফিতনায় আছি, মদিনা থেকে ইহুদিদের বিতাড়নের আগপর্যন্ত সাহাবিরা (রাঃ) আমাদের চেয়েও অনেক গুণ বেশি উৎকন্ঠা আর দুশ্চিন্তায় দিন কাটিয়েছেন। শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) কদাচিৎ তাঁর পিতামাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সুযোগ পেতেন। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাগুতের বাহিনী যখন তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখন বাবা-মার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাঁর তিন মেয়ের সঙ্গেও যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর কন্যাদের একটি হৃদয় নিংড়ানো কবিতা লিখে পাঠিয়েছিলেন, যেটি তার শাহাদতের আগে ছাপানো হয়। জীবনের শেষ দিনগুলোতে তাঁকে একস্থান থেকে অন্য স্থানে ফেরারি হয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়েছে, অবশেষে তাগুতের বাহিনীর হাতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন; রাহিমাহুল্লাহ। আরব উপদ্বীপের তাওয়াগিতের (আল্লাহ তাদের শাস্তি তরান্বিত করুক) হাতে বন্দি হবার চেয়ে তিনি আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর উদাহরণ অনেকটা সেই মহান সাহাবির (রাঃ) মতো যিনি মৃত্যুর চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—আর আমি কুফফারদের হাতে কখনোই বন্দি হব না, মুসলিম হিসেবে মৃত্যবরণ করতে আমি পরোয়া করি না, আল্লাহর দ্বীনের জন্য মৃত্যবরণ করলে ইনশাআল্লাহ তিনি আমাকে উত্তম পুরষ্কারেই পুরষ্কৃত করবেন।

শায়খ ইউসুফ (রাহিঃ) এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন। এসি হলো রুম ভাড়া করে হাজার হাজার মানুষের সামনে গান্ধীবাদি ইসলাম নিয়ে লেকচার দেয়ার ‘সৌভাগ্য’ তাঁর হয়নি, তাঁর লাখ লাখ ফ্যান, ফলোয়ারও ছিল না। যমিনের অধিবাসীদের কাছে তিনি ছিলেন নিতান্তই অপরিচিত এক গুরাবা। কিন্তু এতে তাঁর কী-ই বা এসে যায়। আসমান-যমিনের অধিবাসীদের রব তো জানেন তাঁর কথা। আল্লাহর যমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি যে মেহনত করে গিয়েছেন, হাশরের ময়দানে তা সমগ্র বনি আদমের সামনে সাক্ষ্য দিয়ে বলবে, ‘দেখে নাও হে আদমের সন্তানেরা, ইনি হলেন মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মাহর এক উজ্জল নক্ষত্র।

অভিনন্দন, হে মুজাহিদ শায়খ, অভিনন্দন আপনাকে। যিনি কোনো স্তম্ভ ছাড়াই সাত আসমানকে উঁচু করে রেখেছেন, সেই মহান আল্লাহ (সুবঃ) আপনাকে জান্নাতের সবুজ পাখি হিসেবে কবুল করেছেন। আল্লাহর শপথ! যে ব্যক্তিই আপনার সান্নিধ্য পেয়েছে আপনি তাদের সবার জীবনের গতিপথ পরিবর্তন করে দিয়েছেন, দুনিয়ার শত প্রলোভন উপেক্ষা করে একমাত্র আল্লাহর (সুবঃ) সন্তুষ্টি অনুসন্ধান করতে শিখিয়েছেন। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি জিহাদের ময়দানে যে খেদমত করেছেন, তা অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিদের দ্বারা করা সম্ভব হয়নি। আর আমরা আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি—আপনি আপনার জান, মাল পুরোটাই আল্লাহর যমিনে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যয় করেছেন এমন এক সংকটময় মুহূর্তে, যখন উম্মাহর অধিকাংশ সদস্যই ছিল উদাসীনতায় নিমজ্জিত।

আল্লাহ (সুবঃ) আপনার শাহাদাতকে কবুল করে নিন। আপনাকে ফিরদাউসের ফুল বাগানে সবুজ পাখি বানিয়ে রাখুন। আল্লাহ (সুবঃ) আপনার ওপর রহম করুক ইয়া শায়খ, আল্লাহ (সুবঃ) আপনার ওপর রহম করুন।

সাওতুল জিহাদ ম্যাগাজিন
সংখ্যা ১ এবং ২
শাবান, ১৪২৫ হিজরি।